কবি সুফিয়া কামালকে তাঁর অনবদ্য অবদানের জন্য সিধুভাই স্মৃতি সংসদের পক্ষ থেকে সম্বর্ধনা
২৪শে আগষ্ট, ১৯৯৬

সুফিয়া খালাম্মা

ছোট্ট মোট্ট পাত্লা একটি মানুষ কুষ্টিয়াগামী ট্রেনের থার্ড ক্লাশ কামরায় কাঠের সীটের ওপর দাঁড়িয়ে মাথার ওপর বাঙ্কারের সঙ্গে লাগা একটা লোহার রড একহাতে শক্ত করে ধরে ট্রেনের প্রচন্ড ঝাঁকুনিতে পড়ে যাওয়া থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে এদিকে-ওদিকে দুলে চলেছেন, সবার কুশলের খোঁজ নিচেছন। প্রচণ্ড বৃষ্টির ঝাপটায় সব সীট ভিজে আছে, কামরার ছাদের নানান ফাটল দিয়ে জানালার ফাঁক দিয়ে বৃষ্টি ভেতরে আসছে, কারোই বসবার জো নেই, স্বস্তিতে দাঁড়িয়ে চলবারও অবস্থা নেই। কিন্তু মুখে কোন কষ্টের লেশমাত্র চিহ্ন নাই, নির্বিকার স্নিগ্ধ হাসিমুখ এই ছোট্ট মানুষটির।

১৯৬৫ সাল। সুফিয়া খালার তখন ৫৪ বছর বয়স। ছায়ানটের দল ও ঢাকার অন্যান্য বরেণ্য ব্যক্তিদের সঙ্গে শিলাইদহ যাচ্ছেন রবীন্দ্র মৃত্যু বার্ষিকী উদযাপন করবার জন্য। তাঁর সান্নিধ্যে আমার এই প্রথম আসা। অবাক হবারও সময় দেন নি। প্রথম থেকেই আপন জনের মতো স্নেহে সিক্ত করে দিয়েছিলেন। সবাই সব সময়েই তাঁর অত্যন্ত আপন জন।

নবাব পরিবার থেকে ফুটে ওঠা এই মানুষটি বোধ হয় পূরো জ্ঞান হবার আগেই নিজেকে বাঙ্গালি বলে জেনেছিলেন, বাঙ্গালির বিকাশে আর তার অগ্রযাত্রাতেই নিজের পরিপূর্ণতা জেনেছিলেন। রক্ষণশীল মুসলিম পরিবারের সংস্কৃতি ও শাসনের মধ্যে মেয়ে হয়ে বাংলা শেখা, স্কুলে যাওয়া, তারপর একেবারে বাংলায় কবিতা লিখতে শুরু করা, এ সমস্তই ছিল অভাবনীয়। তবু অভিভাবকরা ছোট্ট সুফিয়ার বায়না এড়াতে পারেননি, মা তাকে চুরি করে বাংলা বই পড়তে দিতেন, স্কুলে তাকে প্রথম পাঠান হয়েছিল পায়জামা-আচকান-টুপি পরিয়ে ছেলে সাজিয়ে, মেয়েদের স্কুলে যাওয়া নিষিদ্ধ ছিল বলে। ভীষণ গোপনে কবিতা লিখে লুকিয়ে রাখতো মেয়েটি, বারো বছর বয়সে বিয়ের পর প্রগতিবাদি স্বামীর কাছে উৎসাহ পেয়ে তবে প্রথম তার কবিতা ছাপা হয়। পারিবারিক রীতি-নীতির কারণে বোরখা পরে 'সওগাত' পত্রিকা অফিসে কবিতা দিতে যেতো, দোতলার সিঁড়ির ওপর উঠে বোরখা খুলে রাখতো মুক্তির স্বাদ পেতে। বাঙ্গালি মুসলমান মেয়েদের মধ্যে প্রথম স্টুডিওতে যেয়ে ফটো তুলে সওগাতে ছাপতে দিয়ে ছিঃ ছিঃ কুড়িয়েছিল। আরো কান্ড করেছিল দুর্দম কৌতুহলবোধে এদের মধ্যে প্রথম এরোপ্লেনে উঠে একা একজন পুরুষ পাইলটের সঙ্গে আকাশে উড়ে পরিবারের ইজ্জত নষ্ট করবার অভিযোগ বরণ করে।

এই ছিল শিশু ও কিশোরী সুফিয়ার জীবনতৃষ্ণার পরিচয় আমাকে শিখতে হবে, আমাকে নিজেকে প্রকাশ করতে হবে আমার লেখার মধ্য দিয়ে, কুসংস্কার থেকে আলোর সিঁড়ি বেয়ে বেরিয়ে আসতে হবে আমাকে, বিজ্ঞানের ককপীট দিয়ে জগৎটাকে আমার দেখতেই হবে, জানতে হবে।

যৌবনের প্রথম পর্যায় সুফিয়ার গেছে বাঁচবার জন্য তীব্র সংগ্রামে। একুশ বছর বয়সে বিধবা হয়ে প্রথম কয়েক বছর কুসংস্কারাচ্ছন্ন পরিবারে লাঞ্ছনার চরম অবমাননাকর জীবন যাপন বরে, এবং পরে কলকাতায় চরম দারিদ্রের সঙ্গে সংগ্রাম করে সুফিয়া সমাজে বিধবার ও বিত্তহীনের অবস্থা উপলব্ধি করেন। এই দুঃসহ কষ্টের মধ্যেও কাব্যের মধ্য দিয়ে তাঁর আত্মপ্রকাশের সাধনা থামেনি। পুনর্বিবাহের পর তাঁর জীবনের ব্রত হয়ে দাঁড়ায় নিপীড়িত মানুষের অধিকার

আদায়ের সংগ্রামে এবং মুসলিম নারীর মুক্তির সাধনায় নিজেকে উৎসর্গ করা। এখন থেকে সুফিয়া কামালের সাহিত্য চর্চা ও সমাজকর্ম, তাঁর সমস্ত জীবন, এই লক্ষ্যে নিবেদিত হয়।

ছেচল্লিশে কলকাতায় সাম্প্রদায়িক দাংগার সময় তিনি নিরলসভাবে দাংগা দমনের ও দাঙ্গার্তদের সেবাকাজে আত্মনিয়োগ করেন। মুসলমান মেয়েদের শিক্ষার জন্য রোকেয়া মেমোরিয়াল স্কুল শুরু করেন। দেশ বিভাগের পর ঢাকায় এসে ভাষা আন্দোলনে শরীক হন, সশরীরে এবং অজস্র লেখার মধ্য দিয়ে। রাজনৈতিক প্রাঙ্গনে যুক্তফ্রন্টকে সমর্থন দেন। একষট্টি সনে পাকিস্তানি শাসকদের নির্দেশের বিরুদ্ধে রবীন্দ্রজন্মশতবার্ষিকি উদ্‌যাপনে জাতীয় আন্দোলনের পূরোভাগে থেকে তিনি প্রেরণা যোগান বাঙ্গালিকে তার সাহিত্য ও সংস্কৃতিকে গর্বের সঙ্গে বুকে জড়িয়ে ধরে তার ওপর বিজাতীয় হামলাকে প্রতিহত করতে। তখন থেকে আমাদের সমস্ত সামাজিক সাংস্কৃতিক ও নারী আন্দোলনে তাঁকে আমরা পেয়েছি সবার সাথে মঞ্চে ও রাস্তায় ও তাঁর কবিতায়। আর একই সঙ্গে নীরবে নিরলসভাবে নারী কল্যানের জন্য কাজ করে গেছেন।

মুক্তিযুদ্ধের সময় প্রতিদিন জীবনের ঝুঁকি নিয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের রেশনের চাল-ডাল আনিয়ে রাখতেন সুফিয়া খালা। যতখানি পেরেছেন মেয়েদের আশ্রয় দিয়েছেন, নিরাপদ আশ্রয়ে পাঠিয়ে দিয়েছেন। সমস্ত বিশ্ব তখন তাঁর নিরাপত্তার জন্য উদ্বেগ দেখিয়েছিল বলে বর্বর পাক বাহিনী প্রচন্ড চেষ্টা করে তাঁকে দিয়ে বলাতে যে তিনি ভালো আছেন্‌ পারেনি, তিনি শুধু বলেছিলেন "আমি মরিনি"। আর কোন প্রশ্নের উত্তর দেন নি, ফটো তুলবার চেষ্টা করলে মুখ ঘুরিয়ে বসেছিলেন। তাঁর নিরাপত্তার জন্য সোভিয়েত সরকার তঁকে বিশেষ বিমানে করে মস্কো নিয়ে যেতে পীড়াপীড়ি করলে তিনি রাজি হন নি। তাঁর সে সময়ের চুড়ান্ত কথা সে সময়ের যে কোন দেশ প্রেমিকের শ্রেষ্ঠ কথা: "এখন আমি এ দেশ ছেড়ে বেহেশ্‌তেও যেতে রাজি নই। আমার দেশের মানুষরা শান্তি পাক, সোয়াস্তি লাভ করুক এই দেখে যেন আমি এই মাটিতে শুয়ে থাকতে পারি।"

এমন ছিল তাঁর জ্যোতি যে ঢাকার আলবদরদের তাকে হত্যা করতে বলা হলে তারা নাকি বলেছিল "আমরা অনেত করেছি কিন্তু তাঁর গায়ে হাত দিতে পারব না। মানুষ পশু হয়ে গেলে তার মধ্যে মনুষ্যত্বের রেশটুকু এভাবে বাঁচিয়ে রাখবার মতো কিরণছটা এদেশে কেন, সমস্ত বিশ্বের মানব ইতিহাসে অল্প কয়েকজন মানুষই বিচ্ছুরণ করতে পেরেছেন।

এই কিরণ ছটার আলোতে এই দেশের অগনিত নরনারী, তরুণ-তরুণী জাতির নানা দুঃসময়ের মধ্য দিয়ে এগিয়ে যাবার পথ দেখতে পেয়েছে। এ দেশে গণতন্ত্রের আলো নিবে যাওয়ার পর দীর্ঘ্যকাল যে শ্বাসরোধকারী স্বৈরাচারীতা চলেছে, মূল্যবোধহীন মানুষের শাসনে ও সন্ত্রাসে জনজীবন বিপর্যস্ত হয়েছে, নারীর সম্ভ্রম লুন্ঠিত হয়েছে, চরমপন্থী সাম্প্রদায়িক শক্তি মাথা চাড়া দিয়েছে, একাত্তরের ঘাতক-দালালরা ক্ষমতার শীর্ষে উঠে আমাদের স্বাধীনতা সংগামকে অপমান করেছে, তখন সুফিয়া কামাল অকুতোভয়চিত্তে প্রতিবাদ করেছেন, সমস্ত সংগ্রামী আন্দোলনকে শক্তি দিয়ে গেছেন তাতে যোগ দিয়ে, তাদের তাঁর প্রেরণাময় বাণী পাঠিয়ে। তাঁর কন্ঠ মৃদু, উত্তেজনা নাই, কিন্তু কী দ্বিধাহীন আপোষহীন শঙ্কাহীন দৃঢ়তা এই মৃদু কন্ঠে। প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি অহরহ তাঁকে শাষিয়ে গেছে, রবীন্দনাথের গানকে প্রার্থনাসম বলেছিলেন বলে তাঁকে হত্যার হুমকি দিয়েছে, এই ছোট্ট মানুষটিকে একটুও বিচলিত করতে পারেনি, তিনি মৃদু হেসে মৃদু কন্ঠে বলেছেন "ওরা আমাকে শাসাচ্ছে"। একবার শুধু দেখেছিলাম এই মৃদুকন্ঠী মানুষটিকে গর্জে উঠতে, ইঞ্জিনিয়ারিং ইনস্টিট্যুটের সামনে তোলা গণমঞ্চে ক্রন্দনরতা ইয়াসমিনের মার পাশে সমবেত নারী সমাজকে উদ্দেশ করে বলেছিলেন "এদেশে কোন সরকার নাই, তোমরা নিজের হাতে এই পৈশাচিক অমানবিকতার বিচারের ভার তুলে নাও"। তাঁর বিশ্লেষণ -যে কতো সঠিক ছিল আজ পর্যন্ত বিচারের প্রতিক্ষায় াপেক্ষমান ইয়াসমীনের আত্মা তার সাক্ষ্য দেয়।

আশ্চর্য এই মানুষটির মধ্যে আমি কখনো অহং দিখিনি। শুভ্র পবিত্র চির স্নেহময়ী মানুষের কল্যাণচিন্তায় পূর্ণ একটি মন, নিজেকে কখনো জাহির করেন নি, নিজের সম্বন্ধে কখনো কিছু তিনি বলেন নি চেপে না ধরলেঅ প্রতিটি মানুষ, যে মানবতার পক্ষে কখনো না কখনো দাঁড়িয়েছে, তাকে তার শ্রেষ্ঠ মূল্য দিয়েছেন, বলেছৈন

"তোমাকে দেখতে ইচ্ছে করে, কত যে তোমার কথা ভাবি" এইভবে প্রত্যেককে বলেছেন তুমি আমার কাছে মূল্যবান। এটি শত শত নরনারীর তরুণ-তরুণীর তাঁর কাছ থেকে পরম পাওয়া, এই আশ্বাস যে অন্ততঃ একজনের কাছে আমার মূল্য আছে। এইভাবেই সুফিয়া খালা সবার মধ্যকার শ্রেষ্ঠ মূল্যবোধকে জাগিয়ে রেখেছেন, দুঃসময়ে এই মূল্যবোধকে আশ্রয় দিয়েছেন, হতাশায় হারিয়ে যেতে দেন নি।

এ যুগের মহত্তম বাঙ্গালি, বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মানব, সুফিয়া খালাম্মা। এখনো সেই ট্রেনের তৃতীয় শ্রেণীতে সবার সঙ্গে চলেছেন বাঙ্গালির ঐতিহ্যকে ছুঁতে তাকে রক্ষা করতে সেই ঐতিহ্যের উপর দাঁড়িয়ে বাঙ্গালি জাতি নিজেকে গড়বে এই প্রত্যয় নিয়ে। প্রবল ঝঞ্ঝায় প্লাবিত আসনের ওপর দাঁড়িয়ে এক হাত ওপরে তুলে মানবতাবোধকে দৃঢ়মুষ্টিতে ধরে দুলতে দুলতে জলেছেন, ঝঞ্ঝার শত তান্ডবেও এ মুঠি এতটুকু শিথিল হচ্ছে না। সাথীদের সবার কুশল খোঁজ করে যাচ্ছেন, আশ্বাস দিচ্ছেন দুর্য্যোগের মধ্য দিয়েই তো আমাদের পথ, আমরা সেখানে পৌঁছাবই, এ বাঙ্গালি অপরাজেয়।

বাঙ্গালির বিবেক, প্রেমময়ী, কল্যাণী, অভয়দাত্রী, সুফিয়া খালাম্মার দীর্ঘজীবন কামনা করি।

স্নেহধন্য

আনিস

(মোঃ আনিসুর রহমান)

সিধু ভাই স্মৃতি সংসদ

Keyword: Sufia Kamal